শিক্ষাদর্শন

(১)

হাল জমানায় ফ্যালাসি অফ জেনারালাইজেশন- হচ্ছে একটি জনপ্রিয় প্রবণতা। সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়,

"পছন্দসই কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ঢালাও সিদ্ধান্ত পৌছে যাওয়া"-কে আমরা বলতে পারি **Fallacy of Generalisation.**

উদাহারণ উপলব্ধির চাবি। গ্রহণ করুনঃ-

"ধরা যাক কেউ একজন প্রচুর মদ খায়, কিন্তু সে খুবই সুদর্শন। এথেকে সিদ্ধান্ত কেউ দিয়ে দিল, যারা মদ খায় তারা সুদর্শন হয়।"

শাহবাগী সেক্যুলারদের কারণে এজাতীয় আলোচনার সাথে আমরা সবাই কমবেশী এপ্রবণতার সাথে পরিচিত আছি। তবে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী দীনের ক্ষেত্রে আন্তরিক কারো থেকেও এমনটা হয়ে যেতে পারে অনিচ্ছাকৃতভাবে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির যোগ্যতা বা সম্মান আক্রান্ত হয়না। আল্লাহ তা আলা সুস্থির রাখুন।

অতঃপর,

আমাদের দেশের মতো ভুমি, যেখানে ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যাবস্থার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়ার মতো সংঘাত চলমান না বা দৃশ্যমানও না, ইসলামপন্থীদের কমিউনিটিকেন্দ্রিক অবস্থানও অত্যন্ত দুর্বল বা নামেমাত্র এবং সর্বত্রই সেক্যুলারদের প্রাবল্য প্রকট;

সেক্ষেত্রে সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটা সাধারণ নীতি সাব্যস্ত করাটা বাস্তবতা ও দীনের চাহিদা নয়। এটা ঠিক। কিন্তু, এটাও সঠিক অবস্থান নয় যে, ঢালাওভাবে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়) বা কর্মস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে নেতিবাচকভাবে দেখা হবে,

অথবা, ঢালাওভাবে এতে সংযুক্ত হওয়ার আহবান জানানো হবে।

এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কি? জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেখা যাক-

" 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' - "এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেকুল্যার, গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।"

(পৃষ্ঠা:৭)

অর্থাৎ, বিপরীতধর্মী আদর্শ তথা ইসলামের বিরুদ্ধে সেকুল্যার শাসনব্যাবস্থার হাতিয়ার বা রণকৌশলের ভিত্তু হচ্ছে এই শিক্ষাক্রম!

এই সাধারণ বাক্যটি থেকেই এই উপসংহারে আসা যায় যে, সেকুল্যার শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিষয়টি কখনই ঢালাও ভাবে উৎসাহিত করা সংগত নয়।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যায়নের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তাও খুব একটা যে নেই তা স্থিরভাবে চিন্তা করলেও বোঝা সম্ভব।

তবুও, আলোচনার সামগ্রিকতার দাবীতে কিছু বলার চেষ্টা করা হচ্ছে-

ক. সমাজের মূল স্রোত মানেই সেকুল্যার শিক্ষাব্যবস্থায় অংশগ্রহণ না। এখনো সমাজের পেশাজীবিদের সিংহভাগ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর নন। নূন্যতম অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সেকুল্যার শিক্ষা কখনই জরুরী না।

খ. বিদ্যমান সেকুল্যার শিক্ষাব্যবস্থার কোনো বিভাগেই এমন কোনো দুর্দান্ত জ্ঞান নেই, যা অর্জন করা ইসলামপন্থীদের জন্য জরুরী। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিকল্প অর্জন যে সম্ভব, তার অন্যতম প্রমাণ শায়খ আবু খাব্বাব আল মিসরী বা ইব্রাহিম হাসান আল আসিরীর ল্যাবরেটরি।

গ. বিশেষায়িত বা দক্ষ জনবলের সংকট নিরসনে ইসলামপন্থীদের করণীয় হচ্ছে, ইতিমধ্যেই যারা এসব শিক্ষাঙ্গন বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তাদেরকে ইসলামের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসা।

পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, দীনের খেদমতের নিয়তে সেকুলার শিক্ষার আত্মীকরণের হার অনুল্লেখযোগ্যই বটে; বিপরীতে সেকুলারদের মধ্যে আত্মিকভাবে সৎ ব্যাক্তিদের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট "দীনের খেদমত" তুলনামূলক বেশী, দ্রুতগামী ও ব্যাপকই বটে।

ঘ. ইসলাম ও সেকুলারিজমের সংঘাতে ইসলামপন্থীদের সফলতা অর্জনে এখন বেশী প্রয়োজন তাওহিদ ও ইসলামের ইলমের সঠিক শিক্ষা ও প্রয়োগের উপলব্ধি, সুন্নাহর আলোকে ইতিহাস ও ভূরাজনীতির গভীর বা সাধারণ মানের জ্ঞান, পশ্চিমা সভ্যতার সমরনীতি ও রাজনৈতিক মূলনীতির জ্ঞান, ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি। যদি এক্ষেত্রে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিশেষায়িত ফায়দা হাসিল করতেই হয়, তাহলে তো অন্য কিছুর পরিবর্তে অগ্রাধিকার পাবে-

দর্শন, নৃবিজ্ঞান, শান্তি ও সংঘর্ষ, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ভুগোল বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদিতে অধ্যায়ন করা। সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার জায়গা তো আর থাকছে না। আর সাধারণত কোনো ছাত্র মেধাতালিকার শেষদিকে স্থান না পেলে এসব বিভাগ নিতে চায়না, এটাই বাস্তবতা।

পাশাপাশি এসব নন-টেকনিক্যাল বিষয়ের শেষ ভরসা সাধারণত হয় বিভিন্ন এনজিও বা বিসিএস (যেখানে প্রবেশের মাঝে অকল্যাণ বেশী থাকাটা সুসাব্যস্ত বিধায়, শরঈ বৈধতা উলামারা দেননি। হ্যা, ইরজার ব্যাধিতে আক্রান্ত বা নফসের মাযহাবের মুকাল্লিদ হলে ভিন্ন কথা।)।

ঙ. এছাড়া ইউনিভার্সিটিগুলোর সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নিম্ন মানের। স্বাভাবিক অবস্থা এটাই যে, এই ইউনিভার্সিটিগুলো এমন ব্যাক্তিত্ব গঠন করে যারা সাধারণত লৌকিকতাপ্রিয়, আত্মশ্লাঘায় আক্রান্ত, পরশ্রীকাতর ও আত্মকেন্দ্রিক।

বিশেষ ব্যাতিক্রম থাকতে পারে, তবে তা একেবারেই নগণ্য। শুধুমাত্র খানকা, চিল্লা বা মাদ্রাসায় কিছু সময় কাটিয়ে এই বিকারগ্রস্ত মানসিকতা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব।

যদি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসা র‍্যাডিকেল চিন্তাবিশিষ্ট ইসলামপন্থীদের পরিসংখ্যানও আমরা যাচাই করি, ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিছুটা নিরাপত্তা বজায় রেখেও যদি বলি,

সাধারণ দীনদারদের কথা যদি বাদও দেই, আমাদের বহুল পরিচিত ইসলামপন্থী বা অনলাইন এক্টিভিস্টদের অনেকের মাঝেও সন্তোষজনক ব্যাক্তিত্ব বা চারিত্রিক দৃঢ়তার সংকট রয়েছে; যার অন্যতম কারণ আমার অভিজ্ঞতায়, সেকুল্যার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা।

চ. সেকুল্যার দার্শনিক সলিমুল্লাহ খান সহজভাবে বুঝিয়েছেন,

প্রচলিত সেকুল্যার শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রজাতন্ত্রের খাদেম বের করে নিয়ে আসা। স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসে যে, ১ম থেকে ২২তম গ্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় লাখ লাখ দক্ষ লোক শুধুমাত্র নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব না। শুধুমাত্র যদি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (১ম-৯ম গ্রেড) চাহিদা পূরনের কথাও যদি ধরা হয়,

মানসম্মত সরকারী গোলাম নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া অপরিহার্য বিধায়ই, শিক্ষার ব্যাপ্তি এত ব্যাপক করা। কেননা, নূন্যতম স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জন ব্যাতীত বিসিএস/পিএসসির নিয়োগের আওতাধীন পরীক্ষার ইঁদুর দৌড়ে অংশই নেয়া সম্ভব না।

এছাড়াও, সেকুল্যার সিস্টেমের বৈধতা আদায়কারী সিভিল সোসাইটি বা বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কিংবা অর্থনীতি সচল রাখতে টেকনিক্যাল পেশাজীবিরাও সক্রিয় ভূমিকা রেখে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সরকারী চাকুরির চেয়ে কিছুটা প্রশস্ততা রয়েছে, এটাও ঠিক।

আসলে এব্যাপারে আরো অনেক অনেক কথাই বলা সম্ভব। প্রয়োজনবোধে হয়তো কেউ করবেন আশা রাখি।

মূল কথা হচ্ছে,

সাধারণভাবে বলা যায়,

এখন পর্যন্ত যারা সেকুল্যার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হননি এবং পারিবারিক চাপ উপেক্ষা করে বিরত থাকার সুযোগ আছে, তাদের জন্য এথেকে দূরে থাকাই ভালো।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মেহনতের জন্য বহু সুযোগ এইচএসসি উত্তীর্ণদের জন্য রয়েছে। আর স্ট্যটাস মেইনটেইন এর চাহিদা তো কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাই নয় কি!?

আর বিশেষভাবে বলা যায়,

উত্তম হলো দীনের ক্ষেত্রে আন্তরিক, দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অবগত, কল্যাণকামী ও তাকওয়ার নিকটবর্তী ধীরস্থির কোনো দীনী মুরুব্বী/ভাইয়ের সাথে বিস্তারিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া, অগ্রসর হওয়া।

কেননা দীন ও দুনিয়ার সামগ্রিক চাহিদার আলোকে ব্যাক্তিবিশেষে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণে তারতম্যের সুযোগ রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

পাশাপাশি,

বাধ্য হয়ে যদি সেকুল্যার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ যদি করাই লাগে, তা হবে অস্বস্তিবোধ ও বিব্রতবোধের সাথে; স্বতঃস্ফূর্ততা, আগ্রহ বা শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির সাথে নয়।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ الۡمَيۡتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحۡمَ الۡخِنۡزِيۡرِ وَ مَاۤ اُہِلَّ بِہٖ لِغَيۡرِ اللّٰہِ ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

"নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে।

সুতরাং যে বাধ্য হবে; অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

“সাঈদ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, غَيْرَ بَاغٍ অর্থ হচ্ছে, তাকে হালাল মনে না করে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "তা তৃপ্তি পরিমাণ খাবে না।"

ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত আছে, " অর্থাৎ মৃত প্রাণীর প্রতি আগ্রহী হবে না এবং তা খাওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না।"

কাতাদা বলেছেন, "যেমন হালালকে অতিক্রম করে হারাম খেল, অথচ সে তা না করেও পারে।"

কুরতুবী রহ. فَمَنِ اضْطُرَّ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, "তার ইচ্ছার বাইরে তাকে তা খেতে বাধ্য করা হয়েছে।”

তাই এমনটা তো কাম্য নয় যে,

আমরা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশের বিষয়টি মহিমান্বিত বা সৌন্দর্যমণ্ডিত করব, মানুষকে আগ্রহী করে তুলব, সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রচার করব।

কেননা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মাঝে মুসলিমদের জন্য সম্ভাবনার চেয়ে আশংকাই বেশী।

যার ঈমান আর ব্যাক্তিত্বের জোর আছে সে দূরে থাকবে আর অন্যরা বাধ্য হয়ে প্রবেশ করলেও, সঠিক স্থানে পরামর্শক্রমে অনাগ্রহের সাথে, জরুরতের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রবেশ করবে।

আল্লাহই ভালো জানেন।

আরো বলা যায়,

সাম্প্রতিক সময়ের কথা বাদ দিলে, ১৮ বছর বয়সের ব্যাক্তিদের কাছে পৌরুষ আশা করাটাই ছিল স্বাভাবিক। অধঃপতিত সমাজের স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে, সমাজে বালকরূপী পুরুষের সংখ্যাই বেশী, ঠিক।

কিন্তু এজন্য শরঈ ও দীনের দাবী খুব সম্ভব উল্টে যাবে না। যা শর্তযুক্ত, তা কিয়ামত পর্যন্তই শর্তযুক্তই থাকবে; অকাট্য বা ঢালাওভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।। সমাজ বৈরী

বা মানুষের ঈমান দুর্বল বিধায়, শৈথিল্যপরায়ণতা কেন প্রকাশ পাবে!? মানুষের জন্য ঢালাওভাবে রুখসত বের করে দেয়া তো দাঈর জিম্মা না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

(২)

আমাদের দেশে, এমনকি গোটা উপমহাদেশে শিক্ষাব্যাবস্থার তিনটি ধারা বিদ্যমানঃ-

ক. কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক দরসে নিজামি। এশিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ইসলামী রাস্ট্র ও সমাজের উপযোগী বিশেষজ্ঞ আলেম প্রস্তুত করা।

খ. জাতীয় পাঠ্যক্রমের অধীন সেক্যুলার শিক্ষাব্যাবস্থা। এ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারী সরবরাহ করা।

গ. এডেক্সেল/ ক্যাম্ব্রিজ কারিকুলামের আন্তর্জাতিক 'ও'/'এ' লেভেল বা ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাব্যবস্থা; যা দুনিয়াব্যাপী বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষায় অধিক কার্যকরী।

যেহেতু প্রথম দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থাই অধিক প্রচলিত; ফলত, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে,

মানুষ হয় দীনের পথে সূক্ষ্ম গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করবে, অথবা ইসলামের বিপরীতমুখী শিবির সেক্যুলারদের ক্রোড়ে বেড়ে উঠবে।

১৩তম শতকের শুরু থেকে ইলমি কেন্দ্রগুলোতে- সমসাময়িক বাস্তবতা, পরিবর্তিত দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান, নতুন প্রজন্মের চাহিদার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করা দূরে থাক, এবিষয়ে ফিকির করাই ছিল অবিশ্বাস্য কল্পনা। ইলম চর্চার এমন এক ধারা সে সময় থেকে চলমান আছে, যার স্রোতে ভেসে আসা মস্তিষ্কে শরয়ী ইলম এবং দাওয়াতি, আস্কারি বা সিয়াসি ময়দানে ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

অবক্ষয়যুগের মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে আলোচনার এক পর্যায়ে শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রাহঃ বলেন, “মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো চরম স্থবিরতা, নির্জীবতা ও বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলো।

সেখানেও ছিল (বাস্তব) জ্ঞান ও চিন্তাগত অবক্ষয়ের ছাপ। মুসলিম বিশ্বের উপর তখন জ্ঞান-বন্ধ্যাত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা কেমন কঠিনভাবে চেপে বসেছিলো, যা থেকে জীবনের কোনো অংগন মুক্ত ছিল না।”

(মা যা খসিরাল 'আলাম পৃষ্ঠাঃ ২৭৮ দারুল কলম)

আর একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা যা 'দরসে নিজামী' হিসেবে সমধিক পরিচিত সেই অবক্ষয়যুগেরই ফসল।

যার ফলে দরসে নিজামির ছাত্র হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়ার পর, উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে নের্তৃত্বের দায়িত্ব নেয়ার সক্ষমতা গড়ে তোলা কঠিন থেকে কঠিনতরই হয়ে উঠছে।

কুখ্যাত প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইস তার ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত **'The return of Islam'** প্রবন্ধে বলেন,

"আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক নের্তৃত্বের অনুপস্থিতি কিংবা সময়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বারা ইসলামকে সুসজ্জিত করে না এমন নের্তৃত্বই বিজয়ী শক্তি হিসেবে ইসলামের গতিকে আটকে রেখেছে।

এমন নের্তৃত্বের অনুপস্থিতিই ইসলামী আন্দোলনগুলোকেও দমন করে রেখেছে। আর এমন নের্তৃত্বই ইসলামী আন্দোলনকে এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে।"

আর ন্যাশনাল কারিকুলাম নামক বিষাক্ত সেক্যুলার শিক্ষাক্রম একেবারেই বিশেষ ব্যাতিক্রম ব্যাতীত প্রডিউস করছে দীনবিমুখ, আত্মপূজারী, পরশ্রীকাতর, উদ্ধত, লম্পট, অস্থিরচিত্ত, তড়াপ্রবণ ও বেয়াদব প্রকৃতির ছদ্ম'শিক্ষিত' শ্রেণীরা। সকলপ্রকার সুন্দর আখলাক থেকে যাদের অবস্থান থাকে সহস্র ক্রোশ দূরে। এর খামির এতই বিনস্ট, তাতে যতই ইলম বা মাওয়ায়েজের পানি দেয়া হোক না কেন, তা কেবল আগাছাই উৎপন্ন করে। আর দিন দিন এই কারিকুলাম আরো নিম্নগামী হচ্ছে তা কারোরই অজানা নয়।

তবে আল্লাহ তা আলা যাদের রহম করেছেন তাদের কথা ভিন্ন।

প্রি-মডার্ন যুগের অতি-বিশেষায়িত দরসে নিজামী আর পোস্ট-মডার্ন যুগের প্রো-সেক্যুলার ন্যাশনাল কারিকুলামের সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত দূরত্ব এত বেশী যে,

উলামায়ে কেরাম ও সেকুস্যলার শিক্ষিত দীনদার শ্রেণীটির মাঝে মানসিক দূরত্ব ও সমন্বয়হীনতা মারাত্মক পর্যায়ের।

আর দিন দিন তা বেড়েই চলেছে, যদিও বহুজনের দাবী ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দরসে নিজামী ফারেগরা সেকুস্যলার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আসলে পুরোদস্তুর সেকুস্যলার বনে যায়। আবার সেকুস্যলার-শিক্ষিতরা দরসে নিজামী বা তৎসংশ্লিস্ট ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠানের সহবতে গেলে প্রাচীন স্থবিরতারই উৎপাদকে পরিণত হোন, অথবা পরিণত হয় আলেমবিদ্বেষী বেয়াদবে!

প্রত্যেকেই বিপরীত শিবিরে গিয়ে আক্রান্ত হোন মুজতাহিদ সিন্ড্রোমে! যে ভারসাম্য অর্জনের চিন্তায় বিভোর হয়ে উভয় শ্রেণীর কতক একে অপরের শিবিরে গমন করেন, তা আর সম্ভব হয় না। বরং, কনভার্শনই ঘটতে থাকে। তবে বিশেষ ব্যাতিক্রম থাকতে পারে।

যার ফলে, আমাদের সমাজে বিশেষজ্ঞ আহলে ইলম ও আহলে আলমানিয়্যার (সেকুস্যলারিজম) বাইরে 'আহলে ঈমান' নামক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক শ্রেনীটির উপস্থিতি ও মূল্যায়ন তুলনামূলক অনেক কম।

সমাজে এশ্রেণীটির অস্তিত্ব থেকে থাকলেও, তাদেরকে স্টেরিওটাইপ করা হয় আলেম অথবা জাহেল শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। যা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং চিন্তাগত স্থবিরতাকে স্থায়ীই করে তুলছে।

অথচ, দুনিয়াবি ও দীনি শিক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী আহলে ঈমান শ্রেণীটিই ইসলামের ইতিহাসে দাওয়াহ, প্রশাসন, তাজদিদ, তাহরিক, সিয়াসাহ, আস্কারি ময়দানে মূল ভূমিকা রেখে এসেছে।

কিংবা আরো ভালো করে বললে, ইসলামী ইতিহাস ও সমাজ বিনির্মানে প্রধাণতম ভূমিকা এশ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্তিরাই রেখে এসেছে।

কেননা, ইসলামী ইতিহাসের রাজনৈতিক বা সামগ্রিক নের্তৃত্বে আমরা সেসব ব্যাক্তিবর্গকেই দেখি, যারা ইলমী ময়দানের তুলনায় রাজনৈতিক ও আস্কারি ময়দানে অধিক বিশেষায়িত ও তৎপর ছিলেন।

ইলমের ব্যাপ্তি অনেক না হলেও, তাদের তাফাক্কুহ, তাকওয়া ও দূরদর্শীতার কমতি ছিল না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এশ্রেণীটির মধ্য থেকেই বরাবরই উঠে আসে জাতির অবিসংবাদিত নেতাকর্মীরা।

এতে সন্দেহ নেই, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমাজে পরহেজগার আহলে ইলমের অভাব কমই বোধ হয়। কিন্তু উম্মাহর বিভিন্ন স্তরে সামাজিক, নাগরিক, রাজনৈতিক পরিপক্কতাসম্পন্ন আহলে ঈমানের সংকট ব্যাপক মাত্রায় রয়েছে। আর এসংকট ও শূন্যস্থান নিরসনে আমাদের জাতির নব্বই শতাংশ মুসলিমের মাঝে সঠিক ও বিশুদ্ধ মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও তেহরিকের উপযোগী শিক্ষানীতির প্রয়োজন রয়েছে।

অন্ততপক্ষে, প্রাথমিকভাবে সিয়াসাহ, তাহরিক, তানজিম ও দাওয়াহর ময়দানে আমানত বহনে সক্ষম, ন্যূন্যতম সংখ্যক মুত্তাকী, দক্ষ ও যুগসচেতন আহলে ফিকর ঈমানদার সরবরাহ করা মুসলিমদের এক অপরিহার্য দায়িত্ব!

শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন,

"এখন সময়ের অনেক বড় প্রয়োজন এবং মুসলিম বিশ্বের অনেক বড় সেবা হলো উম্মাহর বিভিন্ন স্তরে এবং সাধারন মানুষের মধ্যে সঠিক বোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। সবার জন্য সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটলে জাতির মধ্যে সচেতনতাও থাকবে, এটি অনিবার্য নয়। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের বিস্তার সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক। তবে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য মোটকথা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ ও ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা এজন্য বলতে হচ্ছে যে, আলমে ইসলামের জন্য এখন সবচেয়ে বড় খেদমত হলো, এমন বোধ ও প্রজ্ঞা এবং চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করা যাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কপটতা ও

আন্তরিকতা, সংশোধন ও বিনাশ এবং হকের দাওয়াত ও বাতিলের শোরগোলের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারে এবং গ্রহন-বর্জনের সঠিক ও নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বন্ধু যেন অবহেলিত না হয়, শত্রু যেন সমাদৃত না হয়; অপরাধী যেন নিস্তার না পায়; সৎ ও নিষ্ঠাবান যেন উপেক্ষিত না হয়।

নাগরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জটিল থেকে জটিল বিষয়ে মানুষ যেন পুর্ন প্রজ্ঞার সঙ্গে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপুর্ন যোগ্যতার অধিকারী হয়।

এমন জাতি ও জনগোষ্ঠী যতক্ষণ আমরা না পাবো ততক্ষণ কোন কর্মোদ্দীপনা ও কর্মযোগ্যতা এবং জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনের জৌলুসপুর্ন যাবতীয় প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ জাতির ভাগ্য ও সময়ের গতিধারা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভুমিকাই রাখতে পারে না।"

জাতির মাঝে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে উলামায়ে কেরামের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ ইসলামী প্রকল্পগুলোর নের্তৃত্বে থাকা দীনদার শ্রেণীটির গুরুত্ব অপরিসীম। চাই তারা দীনি সংগঠন, মহল্লা, গ্রাম, দাওয়াহ সেন্টার বা মসজিদকেন্দ্রিক কমিউনিটির নেতা, সংগঠক বা সক্রিয় সদস্য।

১৮২৬ এর পর উসমানীদের দ্বারা ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমুহের জাতীয়করণ এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর কঠোর হস্তক্ষেপের পর কেবল ইলমি ময়দানেই বিশেষায়িত আলেম প্রস্তুতের ধারাটি অক্ষত থাকে মোটামুটি।

কিন্তু সিয়াসাত, তাজদিদ, তানজিম বা আস্কারি ময়দানে যোগ্য নেতাকর্মীর উপস্থিতির ক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম শুণ্যতা। বিশেষ ব্যাতিক্রম ব্যাতীত যার মারাত্মক প্রভাব গোটা মুসলিম বিশ্বেই দৃশ্যমান।

এখন সংকট চলমান। বিদ্যমান সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ও আলিয়া উভয়েই) ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যাবস্থা এশ্রেণীটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়নি; তা এক স্বতঃসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

দুষিত সেক্যুলার আধিপত্যের প্রতিরোধ ও ইসলামী সমাজ বিনির্মানে আলেমদের তদারকি, নেগরানি ও দিকনির্দেশনার অনস্বীকার্য ও প্রয়োজনীয় ভুমিকা রয়েছে ও থাকবে। থাকতে হবে।

কিন্তু কিছু সাধারণ সংস্কারের বাইরে গিয়ে এই কস্টসাধ্য ও মহান প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ন্যুন্যতম সংখ্যক যোগ্য ব্যাক্তিত্ব সরবরাহে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও দরসে নিজামী উভয়ই অনুপযোগী। আর তা অনিবার্য কারণেই।

দরসে নিজামীর সমালোচনা নয় এটি।

বরং দরসে নিজামী শরঈ ইলমের হেফাজত ও তত্ত্বাবধানের বিশেষ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ইসলামী প্রকল্পের বড় একটি জিম্মাদারী আদায় করে আসছে। যার দরুণ দাওয়াতি, তাজদিদি, তানজিমি বা সিয়াসি ময়দানে মশগুল হতে আহলে ইলমগণ কিছুটা হলেও অপারগ। এটা সীমাবদ্ধতা নয়, বরং অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আর সেক্যুলার পাঠ্যক্রম, যা মূলত প্রণীত হয়েছে সেক্যুলার রাষ্ট্রের উপযোগী আত্মপূজারী নাগরিক, আমলা ও কর্মচারী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে; তা কখনো সমাজ ইসলামীকরণের কর্মী ও নেতা সরবরাহে উপযোগী হতে পারেনা। বরং, তা বিপরীত ফলাফলই এনে দিচ্ছে আমাদের।

উলামায়ে কেরামকে পরিত্যাগকারী, ভাসাভাসা শরঈ বুঝসম্পন্ন সেক্যুলার ঘরানা থেকে উঠে আসা নেতাকর্মীবিশিষ্ট সংগঠন জামাতে ইসলামী বা হিজবুত তাহরিরের নেতাকর্মীদের দিকে তাকালে আমরা একরুণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা আলা উনাদের নেক আমলসমূহ কবুল করেন। এবং আমাদের সবাইকে ইসলাহ করে দিন।

আমাদের খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে, আহলে ফিকর এই আন্তরিক ও আগ্রহী শ্রেণীটিই সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটাই ইসলামী সমাজের ঐতিহাসিক ও স্বাভাবিক অবস্থা। তারাই হিদায়াতের চেরাগ, যারা রক্ত আর ঘামের মিশ্রণে জাতিকে উর্বরতা দান করে।

ইতিহাস এটাই বলে,

সমাজ পরিচালনা, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে এশ্রেণীটিই নিয়ামক ভুমিকা রেখে থাকে।

সালাহউদ্দিন আইউবি, সাইফুদ্দিন কুতজ থেকে নিয়ে খালিদ মুহাম্মাদ, আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ বা সালাহউদ্দিন যায়দানের মতো মহান ব্যাক্তিরা এশ্রেণীটিরই অন্তর্ভুক্ত।

তাই, ইসলামের পুনরুত্থানে অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী জামাত ও সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচ্ছন্ন ফিকর, বাস্তবতা ও শরয়ী ইলমের উপলব্ধি এবং উদাসীনতা পরিত্যাগের পাশাপাশি আরও প্রয়োজন- নের্তৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান।

উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্থবির চিন্তাধারা এবং প্রায়োগিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ না থাকায়, আহলে ইলম ও আহলে ফিকর শ্রেণীর সমন্বিত সম্পর্ক অত্যাবশ্যক।

আমরা দেখতে পাই যে,

মডার্নিটির প্রভাবে মুসলিম অধ্যুষিত সমাজগুলোতেও আত্মিক ও সামাজিক গুণাবলীর পরিবর্তে, লৌকিকতা ও বস্তুবাদী উন্নতিকে শিক্ষার প্রধাণ উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার নস্ট বিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে।

অভিভাবক নিজ সন্তান বা অধীনস্তদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আসছে, সহজে অর্থলাভ ও সমাজে নিজ সম্মান বাড়ানোর লক্ষ্যে।

অথচ কোনো মুসলিমের কাছে শিক্ষা স্রেফ ভোকেশনাল কোনো বিষয় নয়! ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাক্তি নিজের সাথে, সমাজের সাথে ও আল্লাহ তা আলার সাথে মুয়ামালা শিখবে। অতঃপর, অন্তত পরিবার, এলাকা থেকে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়াহর দাবী প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে। যা কি না আত্মিক, জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ ও চূড়া।

এউদ্দেশ্যে শিক্ষিত মুসলিম ব্যাক্তি নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষের হিদায়াত তো বটেই, সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর কল্যাণেও আমৃত্যু লেগে থাকবে। আর মহান উদ্দেশ্যে তার মূল সম্বলই হবে জীবনের শুরুতে পাওয়া তালিম ও তরবিয়ত।

এজন্য চাই, উম্মাহর উদ্যমী ও আন্তরিক সন্তানদের জন্য একটি সুসমন্বিত শিক্ষানীতি। যে শিক্ষানীতি পরিপূর্ণ চাহিদা পূরণ না করলেও, পরিবর্তনের বাতাস প্রবাহের জন্য জানালা খোলার প্রথম চেষ্টাটি করবে। পরবর্তী পর্বে সম্ভাব্য পাঠ্যক্রমের একটি সাধারণ রূপরেখা উত্থাপন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আর আল্লাহ তা আলাই সর্বোত্তম তাওফিকদাতা।